শিকারী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥শিকারী॥

জংলী দেহাতি বালক মাগনিরাম। রামজীর কাছে মেগে ওকে নাকি কোলে পাওয়া গিয়েছিল। এরা ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, তাই বৈশ্য-বণিকদের মত কুরুচি প্রদর্শন করে না ছেলের ‘লাখপতিয়া’ ‘দৌলতরাম’ প্রভৃতি নাম রেখে।

ঝাঁপড়িশোল গ্রামে ওর বাড়ি।

মোটরের রাস্তা থেকে বাঁ-দিকে বেরুনো সরু রাস্তা। এই রাস্তার কিছু দূরে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের শিমূল গাছের আবাদ। প্রায় তিন চার একর জমিতে শুধু দেড়শো দুশো শিমূল গাছ। ফাল্গুন চৈত্রে ফুল ফুটলে কি অদ্ভুত দেখায় রাস্তা থেকে, নিষ্পত্র বড় বড় গাছগুলিতে আগুন-রাঙা পাপড়ি জ্বলচে শিমূল ফুলের।

শিমূল গাছের আবাদ পার হয়ে একটা নদী, নাম বরজোর নালা, বড় বড় শিলাখণ্ডের পাষাণ বাঁধানো তটভূমির ওপর ছায়ানিবিড় বনপাদশ্রেণী, তাদের তলা দিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে বরজোর নালা ছুটে চলেচে অদূরবর্তী শঙ্খনদীর দিকে। শঙ্খনদী আবার মহাডাল পাহাড়শ্রেণীর তলায় গিয়ে মিশেচে মহানদীর সঙ্গে। সেটা কোথায় গিয়েচে, ঝাঁপড়িশোল গাঁয়ের লোক অত খবর রাখে না। বরজোর নালা পার হয়ে চুকুরদি-তুকুরদি রিজার্ভ ফরেস্ট। চুকুরদি একটা খ্রীস্টান গ্রামের নাম, গ্রামের মধ্যেই ওদের পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গীর্জা। দেওয়ালের শালকাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যাবে একখানা মাত্র টিনের ভাঙা চেয়ার গীর্জাঘরের একমাত্র আসবাব। বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রি সাহেব এসে এদের নিয়ে উপাসনা করেন ও শাস্ত্রকথা বলেন, তাঁর জন্যেই এই চেয়ারখানা যোগাড় করা আছে।

BANGLADARSHAN.COM

চুকুরদি গ্রাম পেরিয়ে মহাডাল পাহাড়ের তিনশো ফুট একটা শাখা পার হয়ে, একটা বৃদ্ধ মাদার গাছ পার হয়ে বনবেষ্টিত বনকাটি গ্রাম। মাত্র ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস, কোল ও মুণ্ডা জাতীয় লোক, এরা খ্রীস্টান নয়।

গ্রামের বাইরে এদের বড় বড় শালগাছের মধ্যে বোঙ্গাপূজার স্থান।

মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্যদেবের উদ্দেশে এখানে মুরগী বলি দেওয়া হয়, গাঁয়ের সবাই বছরে একদিন রেঁধে খায়। হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে যায় বোঙ্গাতলার এক পাশে। বছর বছর পুরনো হাঁড়ির পাহাড়।

বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গনবেড়া, মাঙ্গনবেড়ার পরে ঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তায় কোথায় কতদূরে লুকোনো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে দেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাডাল, কাট্‌চুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতা আগেই বলা হয়েচে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেচে।

জারুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হল্‌দে ফুল ঝরে পড়ে থাকে বনতলা বিছিয়ে। ধনেশ পাখি ডাকে, কেকারব করে বনশীর্ষে ময়ূরের দল।

মাগনিরাম ষোল বছরের ছেলে। ম্যালেরিয়ায়ে ভুগে রোগা শরীর। এই সব জংলী গ্রামে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া একবার যাকে ধরে, তাকে একেবারে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ, পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও সুঠাম, সাবলীল—অধিকাংশ মেয়ের মুখই যেমন সরল, তেমনি সুন্দর।

মাগনিরাম আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্বদা। নিজের অসুখের জন্যেই বোধ হয়।

বন্ধু নন্‌কুয়া এসে বললে—চল্ মাছটা ধরে আনি—

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে বললে—নাই যাবো—

—কেনে?

—উদাস লাগচে মাথাটা।

—দুখাচ্চে?

BANGLADARSHAN.COM

—না হে, উদাস লাগচে। উ কথায় তোর কি কাম? নাই যাবো, ভাগি যা!

—কেনে ভাগবে? ইঃ!

—দিখাবো তোকে? দিখ্‌বি?

—কাঁড় ধরবার, হাত্তি নি, দিখাবি কুথা থিকে? উ অত সোজা?

—ভাগি যা?

—নাই যাবো।

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে। নন্‌কুয়া হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে ঠিক নয়, চলে গেল বলাই সঙ্গত। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মাগনিরামকে কে বা ভয় করবে ওদের মধ্যে।

মাগনিরাম সেই দুঃখেই উদাস মনে থাকে আজকাল।

বরজোর নলা ঘুরে ঝাঁপড়িশোলের নিকট দিয়েই গিয়েচে, সিকি মাইল দূরে একটা বন পার হলেই। এই নালার ধারে বনের ওপারে গ্রামের লোকেরা বর্ষাকালে কান্দা আলু তুলতে যায়। কান্দা আলুর বড় লতা শাল-আসান-

অর্জুন গাছের গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সেই অত উঁচুতে যেখানে বনের ময়ূর নৃত্য করে বর্ষার মেঘ পাহাড়ের শিখরে জমলে—সেখানে ফুটে থাকে কান্দা-আলুলতার নীল ফুল।

মাগনিরাম সে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অত উঁচুতে উঠে ফুল সংগ্রহ করতে পারে না বলে গ্রামের মেয়েরা তাকে ক্ষেপায়, দোষ ধরে, মানুষ বলে ভাবে না।

তারা বলে—কমজুরী লোকটা হে, উ উসব কামের লয়—

ও উত্তর দেয়—গায়ের জুর লা আছে তো কি করচে। তুদের মনটা নেই যে হে—

বুধ্‌নি হেসে বলে—মনে কি করবে?

—উ তোদের বুঝাতে লারবো। জাহিল লোকদের বুঝাবো কি হে?

—উঃ, ভারি জাহিল করতে এসেছে, বড় পণ্ডিতটা আছে তাই দিখাতে এসেছে—ভাগ্যি যাঃ!

—তু ভাগি যা।

ওরা রাগ করে বলে—তুর ঘরে চাউল সিঝাই না মকাই মাগ্‌নি করি যে ভাগি যাবো?

BANGLADARSHAN.COM

এবার মাগনিরাম হাসে। মেয়েদের রাগ দেখে ওর হাসি পায়। বলে—যা যা হুজুমে চালাকানা—ঠ্যাঙাকানা দো—

এ কথার মানে, না গেলে লাঠি মারবো। মেয়েরা রেগে গালাগালি করে আরো। ও হাততালি দিয়ে হাসে। বলে—বিজলি চম্‌কাও কানা দো—

অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। ও চমৎকার গান বাঁধে সেদিনটা বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে। নিজেই গায়। এবার মন দিয়ে শোনে। ওর ওপর তাদের রাগ ও বিতৃষ্ণা অনেকখানি চলে যায়। বোঙ্গা পরবের সময় ও নিজের বাঁধা ছড়া ও গান নিজের বন্ধু নন্‌কুয়া ও ছোট রতুকে শেখায়।

আসলে মাগনিরাম হল কবি।

কবির অংশও বটে, ওর বাবা জাতে সাঁওতাল, কিন্তু রাঁচি শহরে কিছুদিন ছিল। সেই জন্যেই ওর ছেলের নাম মাগনিরাম নতুবা সাঁওতালের ছেলের নাম মাগনিরাম হত না। রামভক্তি সে বিদেশ থেকেই এই নিবিড় বনপ্রদেশে আমদানি করেছিল।

ওর বাবা এদেশে একজন বিখ্যাত লোক। রাঁচি শহরে সে মোটর গাড়ি দেখেচে, টেলিফুঁক দেখেচে, বিজলি বাতি, বিজলি পাখা, কলের গান—কত কি দেখেচে। আজ বছর সতেরো আগেকার কথা। সতেরো বছর ধরে সেই গল্প ভাঙিয়ে খাচ্চে বাড়ি বসে। গ্রামের লোকদের সে অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে, বলে—সেই দুনিয়াটার কি

দেখলি রে? কুথা না গেলি, শরীরটাকে সক্কত হবে কুথা থেকে হে? মনের সক্কত হবে তবে তো শরীরটাকে লাগবে।

ওর কাছে সবাই আশ্চর্য গল্প শুনতে আসে। কত রকম পরামর্শ করতে আসে। ছেলেটিও বাপের ধারা গান বাঁধে। এদিক থেকে সে বাপের চেয়ে এক কাটি সরেস হয়েচে, বলাবলি করে গ্রামের লোকেরা। অবিশ্যি নিন্দা হিসাবেই বলে প্রশংসা করে নয়।

মাগনিরামের মন ওড়ে কান্দালতার নীল ফুল যেখানে ফুটেচে, সেই বনের মাথার ওপরে। বাবাকে সে বড় মানে: বাবা একজন কত বড় লোক। কত দেশ ঘুরেচে। এখানকার জাহিল লোকেরা কি করে বুঝবে তার বাবা কত বড়?

সে যদি জ্বরে না ভুগতো তবে অনেকদূর চলে যেতো এতদিনে–একবার সে গরমিণ্টোর শিমূল গাছের আবাদ দেখতে গিয়েছিল, সেখানে তার কয়েকদিন আগে গরমিণ্টো এসেছিল আবাদ তদারক করতে। গরমিণ্টো মিঠাই ফেলে গিয়েছিল বিলাইতি মিঠাই, লাল নীল রং, কাগজে মোড়া। সে কুড়িয়ে প্রথমে ভাবলে, কি এগুলো?

আবাদের চৌকিদার দেখে বললে–ও বিলাইতি মিঠাই। খেয়ে লাও–

BANGLADARSHAN.COM

সে মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমন সে জীবনে কখনো খায়নি। গরমিণ্টোর মিঠাই ভারি চমৎকার লাগে খেতে।

এ সব ফেলে সে চলে যেতো যে দেশে ঐ রকম আশ্চর্য জিনিস আছে, কিন্তু বাবার জন্য মন কেমন করলে দূরে কি করে যাওয়া হয়? তা ছাড়া, শরীরে অসুখ তো লেগেই আছে, যে জন্যে সে গাছের ওপরে উঠতে পারে না, কাঁড় ধরতে পারে না, পাহাড় ডিঙিয়ে বড় ঝোপের বনে যেতে পারে না। কিন্তু বাবার মত সে নাম-করা লোক হতে চায়, বাবার মনে সুখ দিতে চায়।

বর্ষার বাজরাক্ষেতে যেমন প্রতি বছর পাহাড় থেকে বন্যহস্তির যুথ নেমে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।

পাটোয়ারী কাছারি থেকে ঢেঁঢরা দিয়ে গেল, এবার মস্ত বড় পাগলা হাতি নেমে বন্য গ্রামগুলির অত্যন্ত ক্ষতি করচে। যে হাতী মারতে পারবে, তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রামের মধ্যে জোয়ান শিকারীর দল চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ করে না, পাছে তার মতলব অপরে আত্মসাৎ করে।

ঢেমন সাঁওতাল বনকাটি গ্রাম থেকে এসে একদিন সবাইকে ডেকে বললে–এ বছরের হাতীটি তুরা মারতে লারবি।

সবাই বললে—কেনে হে?

—উ মাদী হাতী আছে। মারতে লারবি।

একজন যুবা শিকারী বললে—কাঁড় টেনে হাতী মারা নেই যাবে? তুমি শিখাতে এসেচ মাদী হাতীটা কি হাতী লয়?

—ই সে হাতী লয়। দেখে লিবি আমার কথা। এ বছর দুতিন আদমি মরবেই সব বস্তির। ঘাটোয়ালি কাছারির লোক টাকা দেবে সিধা বাত শুনে? তা দিবে না। দেখে লিবি।

ঢেমন বড় শিকারী এ অঞ্চলের। একা বাঘ মেরেচে কাঁড় দিয়ে। বিষাক্ত ফলা চালিয়ে হাতী মেরেচে। তার কথা অগ্রাহ্য করবে এমন লোক এ দিকের কোন গ্রামে নেই।

মাগনিরাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঢেমন সাঁওতালের সুগঠিত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মরদ বটে একজন! আজ তার যদি জ্বর না হত, সেও অমনি হতে পারতো। তার বাবা বুড়ো হয়েচে। বাবার হাত থেকে কাজ নিতে হবে এবার তাকে। বাবাকে সুখে রাখতে হবে।

মাগনিরাম কবির দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখে। বাবাকে সাহায্য করতে হবে, সুখী করতে হবে এটা হল কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাইরের দুনিয়াটা শুধু কল্পনাতে চলে না। কল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার কৌশলও শেখা দরকার। মাগনিরাম সেখানে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

BANGLADARSHAN.COM

কতদিন একলা বসে বসে কি ভাবে সেই জানে।

বাবা কত বড় হয়ে যাবে একশো টাকা পেলে! কাড়া কিনবে। কাড়ার দুধ খাবে। গরমিণ্টের মিঠাই আনিয়ে খাবে দুজনে। তার মা কবে মারা গিয়েচে ছেলেবেলায়, তার মনেও পড়ে না। বাবা তাকে মায়ের মত করে মানুষ করেছিল। এখন সে যদি বাবাকে না দেখে, কে দেখবে?

সেদিন সে শুনলে নিমপুরা আর বরজোর নালার ধারে রোজ রাত্রে পাগলা হাতীটা নামচে। মাগনিরাম কাউকে কিছু না বলে বিকেলের দিকে একাই চলে গেল বরজোর নালার ধারে।

বর্ষায় বরজোর নালার কূল ছাপিয়ে জল উঠেচে এপারে বাজরা ক্ষেতে হাতীর পায়ের দাগ সর্বত্র, ক্ষেত তচনচ করেচে হাতী।

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত। মাগনিরাম ঢেমন সাঁওতালকে অনেক খোশামোদ করে দুটি বিষমাখা শলা সংগ্রহ করেচে। বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সেই বিষমাখানো শলা কি ভাবে ছুঁড়তে হয় সেটা দু-একবার দেখে নিয়েচে বটে, কিন্তু নিপুণ হাতে চালায় যারা, তারাই শলা চালাতে ইতস্তত করে, আনাড়ি মাগনিরামের কথা তো অনেক দূরের।

মাগনিরাম বরজোর নালার ধারের একটা কুলগাছে উঠে বসে রইল সন্ধ্যার আগে থেকেই। আপনমনে গুন্ গুন্ করে গান করতে লাগলো। যদি আজ হাতীটা নামে।

অনেক রাত্রে সত্যি নামলো পাগলা হাতীটা। হাতী নয়, সাক্ষাৎ শমন। আজই সন্দেবেলা এই খানিক আগে নিমপুরার একটি বুড়ো ক্ষেতপাহারাদারকে খুন করে এসেচে, তার শুঁড়ে তখনো টাটকা রক্তের দাগ।

মাগনিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একশো টাকা রোজগার করে বাবাকে আনন্দ দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক যখন হাতীটা বরজোর নালার ধারে কুলগাছের পাশে এসেচে, মাগনিরাম বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে শলা ছুঁড়লো।

এর পরের ঘটনা টের পাওয়া গেল সকালবেলা।

বাজরাক্ষেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগনিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁৎলানো টুকরো কিন্তু মাগনিরামের বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিল ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে।

কেন, তা বলি।

বরজোর নালার ওপারে সরকুন্দা জঙ্গলের কিনারায় প্রকাণ্ড পাগলা হাতীটা মরে পড়ে আছে—আবিষ্কার হল তিনদিন পরে। হাতীটার নাকের দুপাশে তখনো দুটো শলা গিঁথে ছিল। ঢেমন সাঁওতাল বীর শিকারী, শলা দেখে বললে—ই তো আমার হাতের শলা আছে হে! বাসুড়ির ছেলেটা আমার কাছ থেকে লিয়েছিল সেদিন। ওর মনে ই ছিল, সেটা কি ক’রে জানচি হে?

ঢেমন সর্দার সাক্ষ্যের বলে ঘাটোয়ালী কাছারির পানিকর মাগনিরামের বাবাকে কাছারিতে ডেকে চারজন সাক্ষীর সামনে টপসই নিয়ে নগদ দশ টাকার দশখানা নোট ওর হাতে তুলে দিয়ে বললে—বাপের বেটা তো ইকে বোলে! চোখের জল না ফেল্‌বি, উ তোর বেটা ছিল না, তোর বাবা ছিল হে!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥